PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-zine due to prolonged Nationwide Lockdown. Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. Mob: 9433284720

সপ্তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই কার্ত্তিক, ১৪২৭ / 24.10.2020

-: সম্পাদক:-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
চরণদাস বাবাজীর অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
শারদীয়া পূজার গোড়ার কথা	শ্রী সুধীর কুমার মিত্র
অসমবেদনা	সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

প্রীতি-কণা

"সংসারের কর্তব্যকর্ম ঠিকভাবে না করে ঈশ্বর ঈশ্বর করবার কোন সার্থকতা নেই। সংসারের কর্তব্যকর্মের ভিতর দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে ও এর মধ্যে থেকে নিজেকে ঈশ্বরের হয়ে উঠতে হবে। সংসারকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করা আত্মপ্রবঞ্চনা করা ছাড়া আর কিছু নয়। ভালবাসা, প্রেম, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। নির্লিপ্ত ও আসক্তিশূন্য হয়ে এবং মনে প্রাণে এই ভাব রাখতে হবে যে এই সংসার ঈশ্বরের। তাঁর কর্ম করছি এই ভাব বজায় রাখতে হবে।"

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

শ্রীপ্রীতিকুমারের খুব চিঠি লেখবার অভ্যাস ছিল। কখনও চিঠির উত্তর দিতে দেরী করতেন না। আমার লেখা চিঠিগুলি তিনি কোথাও রেখেছেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু কেন জানি না তাঁর চিঠিগুলি আমি সংরক্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। এই চিঠিগুলি দেখে এখন মনে হয় তিনি এ জগতে থাকতে যদি অর্থগুলি জেনে নিতাম! নিজেকে বড় মূর্খ আর অবিবেচক মনে হচ্ছে। আসলে আমি বুঝিনি উনি এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। প্রথম চিঠিটি আমাদের একমাত্র সন্তানকে তার শৈশবে লেখা।

*****

শ্রী সুনন্দন ঘোষ 5th March, 1958

বাপী,

তুমি আজ শিশু। মাত্র এগারো মাস বয়স তোমার। এ চিঠি তুমি আজ বুঝতে পারবে না। ধীরে ধীরে তুমি বড় হবে। নানা কৌতূহল হবে সব কিছু জানবার। প্রতিনিয়ত যদি তোমাকে সঙ্গ দিতে না পারি, যদি আমি না থাকি হয়ত সবই জানবে। তবুও তোমার বাপী তোমাকে হয়তো অনেক কিছু দিতে পারত, এ বিশ্বাস থাকবে তোমার মনে। তাই আজ থেকে ঠিক করলাম তোমাকে চিঠি লিখব এবং তোমার মা সেসব যত্ন করে রাখবে। যখন তুমি বড় হবে সব তোমাকে দেখাবে।

আজ আমাদের হিন্দুদের একটি বিশেষ আনন্দের দিন। এই উৎসবকে বলা হয় হোলী উৎসব। এর আর একটি নাম হল বসন্ত উৎসব। ভারতবর্ষের প্রতিটি উৎসবের একটি পবিত্র ভাব আছে। এর বিশেষ অর্থও আছে। যুগের

DO NOT COPY

পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ আজ আর তত পবিত্রতার দিকে ঝোঁকে না বা তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। সত্য অর্থ বিকৃত রূপ নিয়েছে এবং সে শুধু মানুষের বাহ্যিক আনন্দের খোরাক হিসাবে ধরা হয়েছে। যাক, হোলি অর্থ দোল। এ দিনে আবীর দিয়ে সকলের অঙ্গ রাঙ্গিয়ে দেওয়া একটি রীতি। এই দোল উৎসব বহু পুরানো। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে যে (দোল) হোলি খেলেছিলেন সেই উৎসব অতি প্রাচীন। প্রত্যেকটি গোপিনীর মনে হয়েছিল যে শ্রীকৃষ্ণ তারই সঙ্গে হোলি খেলেছেন। ভগবানকে অতি অন্তরঙ্গরূপে কল্পনা করে নিয়ে তাকে প্রীতির সঙ্গে রাঙ্গিয়ে তোলাই দোলের মূল কথা।

বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন এই সময় শরীরে আবীর মাখলে চর্মরোগ হয় না। এ কথাও ঠিক। কারণ এই ঋতু পরিবর্তনের সময়ে নানাপ্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়। বসন্ত রোগ এই সময়ে বিশেষ ভাবে দেখা দেয়। আমার নিজের ধারণা, ঈশ্বরের লীলা হিসাবে, সময় হিসাবে ও আবীরের গুণাগুণ হিসাবে সব কিছু মিলে যে সত্য আছে, তাতে আবীর মাখলে রোগ থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। অবশ্য সর্বোপরি ঈশ্বরের লীলা ও খেলা এ বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় রাখতে হবে। তবেই সব রোগকে জয় করা সম্ভব। আমি এই ৩২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ওষুধ খাইনি। সমস্ত রোগ সম্বন্ধে উদাসীন। তার কারণ ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

দোল পূর্ণিমার পূর্ণ রজনীতে প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্যও দোলের দিন ভারতবাসীর নিকট আর একটি পবিত্র দিন। (শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে পরে জানতে পারবে।)

হোলির মূলসূত্র এবার বলব। পুরাকালে প্রহ্লাদ বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের এক পরম ভক্ত ছিল। তার পিতা হিরণ্যকশিপু শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নামও শুনতে পারতেন না। তিনি অত্যন্ত অহংকারী ছিলেন ও সর্বদা মদে মত্ত হয়ে থাকতেন। তাঁরই ছেলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হবে এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। প্রহ্লাদকে তিনি অসম্ভব অত্যাচার করতেন। বিষ খাওয়ান, সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন এবং হাতীর পায়ের নীচে ফেলে দেন। প্রহ্লাদের মৃত্যুতো হলই না, এবং সে কৃষ্ণ নামও ত্যাগ করলো না। তখন হিরণ্যকশিপু শেষ অস্ত্র হিসাবে পুত্রকে আগুনে পুড়িয়ে মারবেন ঠিক করেন। হিরণ্যকশিপুর এক ভগ্নী ছিল তার নাম হোলিকা। হোলিকার একটি বিস্ময়কর উত্তরীয় ছিল যা আগুনে পোড়েনা। ঐ উত্তরীয় গায়ে দিয়ে হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে করে আগুনে প্রবেশ করবেন ঠিক হলো। প্রহ্লাদ পুড়ে যাবে, হোলিকার কিছু হবে না। সেই ভাবে তাঁরা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ সেই সময়ে এল প্রচণ্ড বাতাস। সেই বাতাসে হোলিকার উত্তরীয় গিয়ে পড়ল প্রহ্লাদের গায়ে। অগ্নি প্রহ্লাদের দেহ স্পর্শ করল না। আর হোলিকা অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরুতে পারলেন না। শোনা যায় বিহার, উত্তরপ্রদেশে এই কাহিনী অবলম্বনে হোলির আগের দিন বহ্নি উৎসব হয় এবং পরদিন হোলি উৎসব হয়। তুমি বড় হয়ে এই কলকাতাতেই দেখতে পাবে বঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদির লোকেরা দলে দলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হোলি উৎসব পালন করছে। দোলের আগের দিন আগুনের মশাল হাতে নিয়ে 'রামাহো' 'জয় সীতারাম' কীর্তন করে খোল করতাল নিয়ে পরের দিনও কীর্তন করে। আমরা বাঙ্গালীরা বিশেষ ভাবে কীর্তন করে থাকি গৌরাঙ্গদেবের জন্মদিন উপলক্ষে। তুমি বড় হয়ে আর অনেক কিছু জানতে পারবে। আমি কিছুটা তোমাকে জানালাম।

আশীর্বাদ করি তোমার জন্ম ও কর্মে আমাদের বঙ্গদেশ গর্ববোধ করুক।

ইতি

তোমার বাপী

শ্রীপ্রীতিকুমার

*****

৬/৬

স্নেহের শ্বেতা,

এ'তো চিঠি নয়। সহজ হিসাবে শ্রাবণের মেঘ ধরে নিয়েছি। যেমনটি তুমি মনে প্রাণে দেখতে কামনা করে থাক, যুগ যুগ জন্ম জন্ম ধরে তাই দেখতে পাবে। তেমনই হব। কোনও সন্দেহ রেখ না। লিখেছ যেমনটি ভেবেছিলাম তেমনটি কিনা। যদি শুনতে চাও বলি।

না চাইতে ঈশ্বর আমাকে অনেক দিয়েছেন। আর চেয়ে যা পেয়েছি তা না বললে ছোট করা হবে তাঁর দানকে। এখন ভয় হয়। আমি অশিক্ষিত, তার উপর অত্যন্ত গরীব। কোথায় রাখব? কোথায় রাখলে বিধাতার দানের অসম্মান

করা হবে না? কি হলে তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারব জন্ম জন্ম ধরে? তবে বলি যখন এই ভাগ্যহীনকে "শ্রী" আঁচল দিয়ে মুড়েছ তখন তা যেন থাকে যুগ যুগ ধরে। কোনও অবস্থায় যেন এ আর লক্ষ্মীছাড়া না হয়।

দেখ, পাওয়া তো যায় সংসারে অনেক। কয়টি লোক আমার পাবার মত পায়?

যত দূরেই যাও সেখানেই আমি পিছনে পিছনে আছি। যুগ যুগ থাকব পিছনে, সঙ্গে, সাথে।

ভালবাসা নিও।

ইতি -

তোমার প্রীতিকুমার

*****

কলিকাতা

১৭/১১/৫৮

সাথী,

নীরব হয়েছ তাই বুঝেছ কোথায় ব্যথা তোমার আমার। যে দিনগুলি চলে গেছে, আজ কেবলই মনে হয় শুধু তর্ক ও দ্বন্দ্বভরে দিন গুলি ফাঁকি দিয়ে ক্ষণেকের জন্য আমাদের মাঝে বিষের বাষ্প ছড়িয়ে চলে গেছে। একটুও বুঝতে পারিনি বা চাইনি আমদের অতীতের ঐ মধুর দিনগুলি কোথায় গেল? যে দিনগুলি একজন অন্যজনের অদর্শনে মৃতপ্রায় হয়ে থাকত। ক্ষুধা থাকত না। নিদ্রা যেত পালিয়ে। সমস্ত আনন্দমুখর পরিবেশ হয়ে উঠত বিষময়। মনে হোত নিজের দেহ বুঝিবা প্রাণহীন হয়ে গেছে। আর আসত নেমে অবসাদ ও ক্লান্তি। কত ভাষা তখন থাকত যা দর্শনে হয়ে উঠত মুখর ও প্রাণময়। ঈশ্বর আমাদের অতীতে প্রেম ও ভালবাসায় কত না মুগ্ধ হয়ে করেছেন আশীর্বাদ।

আজ কেবল মনে হয় এই যে সত্য, এই যে সুন্দর, এই যে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মত আমাদের হৃদয়ের প্রেমের যে ঢেউ ছিল তা কি সবই মিথ্যা হয়ে যাবে? সামান্য বস্তুজগতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের জন্য? বিশ্বাস আমার ছিল আজও আছে আমরা পাব আমাদের অতীতের ঐ মধুময় দিনগুলি। যত দৈন্য ও দারিদ্র্য আমাদের থাকুক না কেন তবু পাব আমাদের হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ।

বরাবর তোমাকে বলেছি আমাকে বাইরে দেখে বিচার করলে আমাকে বুঝতে কষ্ট হবে তোমার। তুমি যাদের দেখ আমার কাছে আছে ও আসছে তারা পায় আমার মধুর ব্যবহার, আর তোমার জন্য থাকে আমার হৃদয় ও প্রাণ। তাই বরাবর কষ্ট হয়েছে তোমার বুঝতে আমাকে।

গীতার কর্মযোগ হোল আমার আদর্শ। তাই সমতাবোধ এসেছে। সকলেই সমান আমার কাছে। জান, যারা আমার কাছে আসে তারা ব্যথায় কাতর হয়ে আসে। আমার ভালবাসা দিয়ে তাদের এই দুঃখ ও ব্যথা মুছিয়ে দিই। সম্বল আমার কিছু নেই। তাই ওইটুকু যা আছে তা সকলকেই দিই আর তৃপ্তি পাই আমি আর পান ঐ ভগবতী জননী। তুমিও পাবে, কারণ আজ তুমি সন্তানের জননী হয়েছ। ব্যথা ও দুঃখবোধ তোমার এসেছে।

তোমার প্রতি আমার রাগ, দুঃখ বা অভিমান কিছু নেই। অনুযোগ ও নালিশ আমার নেই। শুধু তুমি জীবনে দুঃখ ও ব্যথা না পাও। তোমাকে ও তোমার ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে ভালবাসুক, তুমি সুখী হও এই একমাত্র আমার উদ্দেশ্য। নিজের সুখ ও সুবিধার জন্য তোমাকে কখনও বকিনি। যখন তোমার ভুল দেখেছি, তোমাকে সংশোধন করার জন্য আমার মুখ খুলেছি। হয়তো তা কটূ হয়েছে, হয়তো ভুল বোঝার জন্য পেয়েছ ব্যথা। তবুও উদ্দেশ্য তোমার জীবনকে সুন্দর ও মধুময় করে তোলা। চেয়েছি নীরবে তোমার ভিতর তোমার অতীতের প্রেমময় ভালবাসা। তোমার ঐ প্রেম ভালবাসা আমার একমাত্র সম্বল ও গর্বের বস্তু। তোমাকে বরাবর বলেছি জীবন আমার দুঃখ ও ব্যথায় ভরা। তোমাকে চাইছি একান্তভাবে তার কারণ তোমার প্রেম ও ভালবাসার কাছে আশ্রয় পাবো। তাতে আমার জীবন যেমন হবে সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত, তেমন এই সংসারে কিছু দেবার জন্য হতে পারব তৈরি। পূর্ণভাবে আশ্রয় না পেলে জীবন ও জন্ম সার্থক হয়না। তাই গভীর ভাবে তোমার প্রেম ও ভালবাসার নিকট আশ্রয় খুঁজেছিলাম। আশা আজও আছে, আরও থাকবে, জন্ম জন্ম থাকবে কারণ ঈশ্বরের ইহাই নির্দেশ।

DO NOT COPY

আমি তোমার নিকট চেয়েছিলাম তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও। হাজার দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে তুমি দাঁড়াও। কারণ আমি একান্তভাবে মানবকল্যাণের জন্য ঈশ্বরমুখী হতে চেয়েছিলাম। মানুষ জন্মাবধি বংশ পরিচয় পায়না, কর্মের দ্বারা সে পরিচয় তৈরি করে। প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে গেলে দুঃখ ও কষ্ট থাকবে। তাতে দুঃখ করলে চলবে না। কর্মক্ষেত্রের ও বস্তুজগতের ব্যবধান সত্য নয়। আর ইহা ক্ষণিকের। তুমি যেখানে থাক, আমি সেখানেই থাকি প্রতিনিয়ত। তুমি কি অনুভব কর না এই সত্যকে? নিশ্চয়ই কর। তা না হলে এই সাহস ও শক্তি এলো কোথা থেকে? এই পবিত্র ভাব না থাকলে তুমিও যুদ্ধ করতে পারতে না। তুমি শুধু জেনো যাইহোক আমি শুধু তুমি হয়ে আছি।

আমার ভালবাসা নাও। বাপীকে আমার স্নেহ চুম্বন দিও।

ইতি -

তোমার প্রীতিকুমার

• * *

২২/২

সাথী,

তোমাকে আগের থেকে জানাচ্ছি, পরে রাগ কোর না। ৪/৫ তারিখে হয়ত সব দিক ব্যবস্থা করে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ আনতে গেলেও টাকার দরকার। তারপর এখানে এলেও লাগবে। আমি ১১/৩ তারিখে যাব এবং শনিবার ১৪/৩ তোমাকে নিয়ে আসব। সেই মত সব ব্যবস্থা কোর। আমি যদি এর ভিতর সব ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে কোন ভাবনা নেই। তুমি ১১ দিনের মত চাল ডাল কিনে নিও। ডাল ইত্যাদিত আছেই। শুধু চাল ও চিনি ...।

যদি জীবনে উন্নতি করতে চাও তবে বি.এ. পাশ করা একান্তই দরকার। যদি পাশ করতে হয় তবে অন্য সমস্ত চিন্তা, সুখ ও দুঃখ সব ভুলে, ভোগ ও বাসনা সবই ত্যাগ করে নিয়মিত পড়াশুনা করতে হবে।

আমি তোমার সহায়। ঁমা তোমার সকল কর্মের পশ্চাতে।

আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি B.A. পাশ কর এবং নিজের নিজের উন্নতি, নিজের সুখ নিজে বেছে নাও।

শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানবে।

ইতি -

তোমার প্রীতিকুমার

* * *

23/2

সাথী,

হাতের চিঠি ও Post-এর চিঠি দুই পেয়েছি, পিসেমশাইকে লিখেছি। দু এক দিনের মধ্যে আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসব। যদি সেখানে নাই হয় খুব কষ্ট করে থাকবার মত জায়গাও আছে। তোমায় ভাবতে হবে না। আজ যে চিঠি দিয়েছি তাতে ১১/৩-এ যাব লিখেছি। যদি আমার জন্মদিনে যেতে বল যাব। সেদিন থাকবো তোমার কাছে। কোনও উপহার চাইনা। শুধু জন্ম জন্ম মধুর সোহাগ যেন তোমার কাছ থেকে প্রাণ ভরে পাই। এর বেশী কিছু আমার কামনা নেই। একটি সুন্দর Diary পাঠালাম। তোমার আমার নিত্য জীবন বেদ গাথার জন্য পাঠালাম। গ্রহণ কোর অন্তরের সঙ্গে। আমি আজ কয়দিন খুব আর্থিক অনটনে আছি। তাই শূন্য হাতে ভানুকে যেতে হচ্ছে। বাবুর জন্য চিন্তায় আছি। ওকে আমার স্নেহচুম্বন দিও।

ভালবাসা নিও।

ইতি –

তোমার প্রীতিকুমার

DO NOT COPY

চরণদাস বাবাজীর অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

উচ্চ স্তরের বৈষ্ণব এবং উচ্চ কোটির সাধক ছিলেন চরণদাস বাবাজী। তাঁর সমসাময়িক নবদ্বীপের জ্ঞানানন্দ স্বামী অবধূত প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের কাছে চরণদাস বাবাজী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলতেন, নামকীর্তন শুরু হওয়া মাত্র চরণদাস বাবাজীর দেহে নিতাইগৌর দুই ভাই খেলা করতে থাকেন, নিজের কোন অস্তিত্বই যেন থাকে না। এ আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। আর তা নইলে কি যে সে রকমের কয়েকটি মাত্র ভক্ত সঙ্গী নিয়ে কীর্তনানন্দের এমন তরঙ্গ তুলতে কেউ পারে?

পুরীর জগন্নাথদেবের শিঙ্গারী পাণ্ডা মাধব পশুপাল চরণদাস বাবাজীকে বলতেন, "বড় বাবাজী মহারাজ, আপনি পুরীতে না থাকলে মনে হয় জগন্নাথদেব যেন নিরানন্দ থাকেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি হচ্ছেন প্রভুর অন্যতম আপনজন।"

এই মহাসাধকের জীবনে একাধিক অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ ঘটেছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

নবদ্বীপে রয়েছেন চরণদাসবাবাজী। মন্দিরে যথারীতি বিগ্রহ দর্শন এবং ভজন-কীর্তনের পর সেদিন সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গে নিজের আশ্রমগৃহে এসেছেন চরণদাস বাবাজী। ঠিক সেই সময় কীর্তনের প্রাঙ্গণ থেকে তাঁর এক সঙ্গী জুটল। সে কোনও মানুষ নয়, একটি কুকুরী।

সে চরণদাসজীর কীর্তন শুনে এতই মুগ্ধ হলো যে তাঁর সঙ্গ ছাড়তে চাইলো না। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলো আশ্রমগৃহে।

বাবাজী তাঁর নাম রাখলেন, ভক্তি-মা। এই ভক্তি-মা বাবাজীর আশ্রমগৃহে বেশ কিছুদিন রইলো। প্রতিদিন সে আশ্রমগৃহের কীর্তনের আসরে যোগ দিয়ে আনন্দ পেত।

একদিন হঠাৎ তার মৃত্যু হলে বাবাজী তার সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। জাহ্নবীর পূত সলিলে ভক্তি-মার দেহ বিসর্জিত হলো।

তারপর বাবাজী ভক্তি-মার ধামপ্রাপ্তি উপলক্ষে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই ব্যাপারে সারা নবদ্বীপের বৈষ্ণব মণ্ডলীকে নেমন্তন্ন করা হলো। সেই সঙ্গে নেমন্তন্ন করা হলো নবদ্বীপের সমস্ত কুকুরদের।

চরণদাস বাবাজীর এ হেন প্রস্তাবে অবাক হলেন তাঁর ভক্ত অনুচরগণ। তাঁরা ভাবলেন, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! একে তো কুকুরের শ্রাদ্ধ কখনো শোনা যায় নি। তার ওপর সারা নবদ্বীপ শহরের কুকুরদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে। এরকম তো কখনো শুনি নি। চরণদাস বাবাজী পাগল হলেন নাকি! লোকে শুনলে বলবে কি?

একনিষ্ঠ ভক্ত নবদ্বীপ দাসের ওপর এ-কাজের ভার পড়লো।

নবদ্বীপদাস চরণদাসজীকে যখন প্রণাম করছিলেন, তিনি সেই সময় ভক্তের পিঠে এক চপেটাঘাত করেন।

সেই চপেটাঘাতে ভাবের পরিবর্তন হলো নবদ্বীপ দাসের। তিনি টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। ঐ ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই নবদ্বীপ দাস নবদ্বীপের পথে-প্রান্তরে ঘুরে গুরু-নির্দিষ্ট কর্ম করতে লাগলেন।

সমস্ত মঠ ও আখড়ার সাধু, মোহান্ত ও ভক্ত বৈষ্ণবদের নেমন্তন্ন জানানো হলো।

তারপর ভগবানদাসজী নবদ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কুকুরদেরও নেমন্তন্ন জানিয়ে এলেন। তিনি গলায় কাপড় জড়িয়ে করজোড়ে কুকুরদের কাছে জানালেন, আমাদের ভক্তি-মা দেহ রেখেছেন। আগামীকাল তার মহোৎসব। আপনারা সবান্ধবে বড়াল ঘাটের কাছে আমাদের গুরুদেবের আশ্রমে মহাপ্রসাদ নেবেন।

যথাসময় মহোৎসব আরম্ভ হলো। ঐ দিনে এক গোলমাল দেখা দিল। বৈষ্ণব আখড়ার সাধুরা বেঁকে বসলেন। তাঁরা বললেন, যে মহোৎসবে কুকুরদের নেমন্তন্ন হয় সেখানে আমরা কিভাবে আসন গ্রহণ করবো? এ আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সবচেয়ে দুশ্চিন্তা হলো বৈষ্ণব ভক্তদের। তাঁরা ভাবলেন, বাবাজির এ আবার কি নতুন খেলা? কুকুরেরা মানুষের নেমন্তন্ন কিভাবে বুঝবে? বিয়ে বাড়ী বা কাজের বাড়ীতে বড় জোর দু'দশটা কুকুরের দেখা মেলে। এ একেবারে সারা নবদ্বীপধাম ভেঙ্গে কুকুরের দলকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তাদের অতো বোধবুদ্ধি কোথায়? তারা কি একসঙ্গে পথ চিনে এখানে আসতে পারবে?

এই সব চিন্তা উদয় হলো ভক্তদের মনে। তাঁরা তাঁদের মনের কথা প্রকাশ করলেন না বাবাজীর কাছে।

আবার ওদিকে রাধেশ্যাম বাবাজী নবদ্বীপে এলেন। তাঁর মনে ক্রোধ জেগেছে। তিনি বাবাজীর কাজে ঘোরতর আপত্তি জানান। বললেন, এ তোর কি পাগলামি? শেষকালে কি লোক হাসাবি? তোর নিন্দে শুনলে যে আমাদের গায়ে লাগে। এবার কোথায় তোর নিমন্ত্রিত কুকুরের দল বলতো?

আত্মপ্রত্যয় ভরা কণ্ঠে চরণদাসজী বললেন, বাবা, আপনারা তো বলে থাকেন, প্রভু সর্বঘটে বিরাজমান। কুকুরদের ঘটে কি তিনি তাহলে নেই? প্রহ্লাদের জন্যে স্ফটিক স্তম্ভ থেকে তো নৃসিংহ মূর্তি বের হয়ে ছিলো। তবে এত সচেতন প্রাণীদেহ, এর মধ্যে দিয়ে কেনই বা প্রভুর লীলা প্রকট হবে না? নিতাইচাঁদ সর্বত্র রয়েছেন। একথা সত্যি। আমি নিশ্চয় করে বলছি এই কুকুর সমাজ দিয়ে আমার রঙ্গিয়া নিতাই নবদ্বীপের মানুষকে এক অপূর্ব রঙ্গ দেখাবেন।

বাবাজীর বাণী মিলে গেল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে কুকুরেরা এসে মহোৎসবে যোগ দিলে। ঠিক নিমন্ত্রিত ভদ্র অতিথিদের মত কুকুরেরা নিঃশব্দে এবং শান্তভাবে বাবাজীর আশ্রম গৃহে হাজির হতে লাগলো। বাবাজীও তাদের যত্ন সহকারে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তাঁর মুখ হতে উচ্চারিত হতে লাগলো, 'জয় নিতাইচাঁদের জয়'।

এরপর কুকুরেরা খেতে বসলো। বাবাজী তাদের যত্ন করে খাওয়াতে লাগলেন। খাওয়া শেষ হলে কুকুরের দল নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করলো।

কুকুরের খাওয়া শেষ হলে আখড়ার গোঁসাইরা যত্নসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। তাঁরা বাবাজীকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

চারদিকে তখন চরণদাসবাবাজীর জয়। প্রেমাশ্রু নয়নে রাধেশ্যাম বাবাজী চরণদাস বাবাজীকে আলিঙ্গন করে বললেন, বাবা চরণদাস, তোর যে নিতাই চাঁদের ওপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে আর তুই যে একজন প্রকৃত সাধক হয়েছিস এই দেখে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি কখনো ধারণা করতে পারিনি যে তুই এত বড় একজন সাধক হবি। ধন্য বাবা, ধন্য তোর এই ভক্তি বিশ্বাসের শক্তি। আশীর্বাদ করি তোর সাধনা আরও সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক।

একদিন চরণদাসবাবাজী কৃষ্ণনগরের পথে সপার্ষদ কীর্তন গাইতে গাইতে চলেছেন, 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম'।

পায়ের ওপর পা রেখে বঙ্কিম ভঙ্গীতে এগিয়ে চলেছেন চরণদাস বাবাজী। তিনি চলেছেন সকলের আগে। আর সকলে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন।

ভাবে বিভোর হয়ে নেচে নেচে চলেছেন চরণদাসবাবাজী। অথচ পথ চলতে তিলমাত্র ভুল হচ্ছে না। কোথায় কোন পথ গেছে তার ঠিকানা যেন তাঁর নখদর্পণে। পার্ষদরা তাই দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন বাবাজীকে, বাবাজী মহারাজ, এসব পথঘাট কি আপনার পরিচিত? বাবাজী সামান্য হেসে উত্তর দিলেন, ওরে আমি না চিনলে কি হবে আমার নিতাই যে এসব পথঘাট চিনে রেখেছে। নাম আর নামী অভিন্ন। এই কীর্তনের সঙ্গে আমার নিতাই চাঁদ যে নামরূপে চলেছেন। তাঁর কাছে অজ্ঞাত-অগন্তব্য বলে কিছু নেই। একমাত্র নামাশ্রিত হয়ে চলতে থাক। যেখানে যেতে চাস তিনি তোদের ঠিক সেখানে পৌঁছে দেবেন।

মহাপুরুষ ও পরম সিদ্ধ সাধক চরণদাসবাবাজীর এমন সুন্দর ও আনন্দময় কথা শুনে মুগ্ধ হলেন তাঁর লীলাপার্ষদগণ।

DO NOT COPY

মহাপুরুষ চরণদাসবাবাজী অলৌকিক বিভূতির যেন সীমা পরিসীমা নেই। কীর্তনবাসরে যখন তিনি কীর্তনে বিভোর হয়ে পড়েন তখন অতি বড় পাষণ্ড ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী মানুষও তাঁর প্রতি বিমুগ্ধ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়ে দিব্য ভাবে মাতোয়ারা হন। এমনি ধারা ঘটনা একদিন ঘটে গেল তাঁর কীর্তনবাসরে।

সেদিন কীর্তনবাসরে বসে চরণদাসজী সপার্ষদ কীর্তন গেয়ে চলেছেন। বাসরের অদূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এক নৈষ্ঠিক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। বহু নামী এবং গুণী ব্যক্তি তাঁর শিষ্য।

এহেন নৈষ্ঠিক ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ চরণদাসজীর কীর্তন শুনে ভাবে বিহ্বল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে।

চরণদাসজীর পার্ষদগণ ঐ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের ভাববিহ্বলতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, উনি তো একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক। শক্তিসাধনার মূর্ত বিগ্রহ। তবে উনি কেমন করে প্রেম-ভক্তি সাধনায় এমন তন্ময় হয়ে গেলেন? ওঁর মনে এমনধারা দিব্য ভাবের উন্মাদনা কিভাবে সম্ভব হলো? তবে কি মহাপুরুষ চরণদাস বাবাজীর দিব্য ও অলৌকিক বিভূতির স্পর্শে এমনটি সম্ভব হলো?

ঐ নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কীর্তন অঙ্গনের পবিত্র রজে উন্মত্তের মত গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তার ফলে তাঁর গৈরিক বসন, রুদ্রাক্ষের মালা এবং সিঁদুরের টিপ নষ্ট হতে চললো। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি ভাবাবেগে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন কীর্তন অঙ্গনের পবিত্র রজে।

পরে শান্ত হয়ে ঐ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণটি বলতে লাগলেন, বাবা তোমরা শোন, আমি ঘোর অপরাধী। আমার মনে বড় অহঙ্কার ছিল। ভাবতুম, নিতাই-গৌরভজার দল অপদার্থ। ওদের প্রতি আমার জাতক্রোধ ছিল।

কিন্তু আজ আমার সেই ক্রোধ কোথায় যেন কর্পূরের মত উবে গেল। এই কীর্তন বাসরে আমি দেখলুম সেই জ্যোতির্ময় দেহধারী যুগল দেব-মূর্তি গৌর-নিতাই। ঐ অলৌকিক দৃশ্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে ঐ অলৌকিক দৃশ্য বেশিক্ষণ নয়নগোচর হলো না। তারা নিমেষে অন্তর্হিত হলেন। তোমরা সকলে আমাকে দয়া করো।

নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের মুখে এমন কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন চরণদাসজীর লীলাপার্ষদগণ।

অতঃপর চরণদাস বাবাজী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বাবা নাম ও নামী যে অভিন্ন। তিনি নামরূপে সর্বদা প্রত্যক্ষরূপে বর্তমান। এই নামকীর্তন ক্ষেত্রে আপনি নিতাই-গৌরের দিব্য দর্শন লাভ করেছেন। আপনার ওপর মা মহামায়ার অশেষ কৃপা।

মহাপুরুষ এবং সিদ্ধ সাধক চরণদাস বাবাজীর জীবনে অলৌকিক বিভূতির যেন সীমা-পরিসীমা নেই। একদিন চরণদাসবাবাজী তাঁর অনুচরদের নিয়ে নগরের পথে কীর্তন গেয়ে চলেছেন। নগরের একপ্রান্তে ভুবনমোহন মিত্রের বাড়ী। ভুবনমোহন অত্যন্ত ধীর-স্থির প্রকৃতির মানুষ।

হঠাৎ বাবাজীকে দেখে তিনি ভাবলেন, শুনেছি ইনি একজন শক্তিধর পুরুষ। ইনি যদি আমার এই কুটিরে অনাহুত হয়ে আসেন এবং তুলসী মঞ্চের সামনে কীর্তন করেন তাহলে বুঝবো, ইনি সত্যই এক সমর্থ সাধক এবং অসামান্য সিদ্ধ পুরুষ।

ভুবনমোহনের মনোবাসনা অচিরে জানতে পারলেন অন্তর্যামী চরণদাস বাবাজী। কিছুক্ষণ পরেই কীর্তনের শোভাযাত্রার গতি গেল বদলে।

সপার্ষদ চরণদাস বাবাজী প্রবেশ করলেন ভুবনমোহনের বাড়ীতে। অপরিসর অঙ্গনের মধ্যে তিনি উদ্দণ্ড কীর্তন আরম্ভ করলেন। তাই দেখে বিস্ময় ও আনন্দ বোধ করলেন ভুবনমোহন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহাপুরুষের প্রতি তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদিত হলো।

DO NOT COPY

বাবাজীর কীর্তন-গান শোনার জন্যে অগণিত দর্শকের ভীড় হয়েছে ভুবনমোহনের বাড়ীতে। তিল ধারণের আর জায়গা নেই।

এমন সময় দেখা গেল এক অলৌকিক ব্যাপার। একটি লোক ভাবাবেশে কীর্তন বাসরে ঢুকে পড়ে নৃত্য করতে লাগলো। তার মুখে কেবল 'মা-মা' রব।

হঠাৎ সে মাটির ওপর আছড়ে পড়লো। গড়াতে গড়াতে চলে এলো চরণদাস বাবাজীর সামনে। পরে তার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি ধরে চুষতে আরম্ভ করলো। তার তখন অর্দ্ধ বাহ্যদশা।

ওদিকে বাবাজীও ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত রক্তবর্ণ।

দর্শকরা ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলো তার মুখের দুই কষ বেয়ে দুধের মত সাদা, রসধারা গড়িয়ে পড়ছে।

পরে হঠাৎ নিজের চেতনা ফিরে পেয়ে আনন্দিত মনে লোকটি বলতে লাগলো, আমার অনেক কালের বাসনা ছিল যে আমি ছোট্ট শিশুটির মত মায়ের স্তনদুধ আস্বাদন করবো। আজ এই মহাপুরুষের কৃপায় আমার সেই বাসনা পূর্ণ হলো।

এমনি অনেক অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দেখা যায় মহাপুরুষ সিদ্ধ সাধক চরণদাস বাবাজীর মহাজীবনে।

"মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব, অশুভবিনাশী তরবারি তব, অজ্ঞানবিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভহন্ত্রী হইয়া তরবারি ঘুরাও, জ্ঞান-দীপ্তি প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও।"

শ্রীঅরবিন্দ (দুর্গা-স্তোত্র)

শারদীয়া পূজার গোড়ার কথা

শ্রী সুধীর কুমার মিত্র

বাংলা দেশে শারদীয়া পূজা যেরূপ মহা সমারোহের সঙ্গে এখন সুসম্পন্ন হয়, এরূপ পূজা ও উৎসব একত্রে ভারতে আর কোথাও হয়না। ভারতের অন্যান্য স্থানে আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নবরাত্রি ব্রত যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ব্রতী একটি ঘট স্থাপন করে সামান্য আয়োজনে পূজা করেন। কিন্তু বিরাট মূর্তি নির্মান করে দশভূজা দুর্গার পূজা একমাত্র বাংলা দেশে বাঙ্গালী ছাড়া আর কেউ এই পূজা করেন না। বাঙ্গালীর এখন ইহা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে বলা যায়।

দেবতা ও মানুষের মধ্যে আছে অনেক রকমের ভেদ; তার মধ্যে প্রধান হলো - দিন রাত্রির পরিমাপ। দেবতাদের দিন হয় ছয় মাস, রাত্রি হয় ছয় মাস; আর মানুষের দিন বার ঘন্টা ও রাত্রি বার ঘন্টা। মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস হচ্ছে দেবতাদের দিন; তার নাম হচ্ছে উত্তরায়ণ। আর শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস হচ্ছে দেবতাদের রাত্রি। তাকে বলে দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণে দিনমান, তাই দেবতারা জেগে থাকেন। দক্ষিণায়ণে রাত্রি, তাই তাঁরা ঘুমোন। চণ্ডীতে বর্ণিত সুরথ রাজা যে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চনা করেছিলেন, সে দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শাস্ত্রমতে চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে। বসন্তকালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দুজনে ঋষির আদেশে একত্র হয়ে এই পূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন বসন্তকালে। তাই ইহাকে বলে বাসন্তী পূজা। ঋষি বলেছিলেনঃ

অবিচারে লও ভূপ তাঁহার শরণ ।
সঙ্কষ্টেতে দিবে স্বর্গ আর মোক্ষধন ।।

দেবী দুর্গার অর্চনা করে রাজা সুরথ স্বর্গ পেয়েছিলেন। সমাধি বৈশ্যও মুক্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শরৎকালে দেবী যখন দক্ষিণায়ণে নিদ্রিতা ছিলেন, তখন অকালে জাগিয়ে তাঁকে বোধন করে অর্চনা করেন বলে ইহা কালবোধিত ও শাস্ত্রানুমোদিত পূজা না হলেও এই শারদীয়া পূজাই আজকাল মহাপূজা বলে আমাদের দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বাসন্তী পূজা কালবোধিত পূজা বলে এই পূজায় বোধনের দরকার হয় না। কিন্তু শারদীয়া

DO NOT COPY

পূজা বোধন না করে কখনও করা যায় না। বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত পূজার নিয়ম ও বিধি নিজেই সব জানিয়ে দেন। রঘুনন্দন স্মৃতিতে দুর্গাপূজার সাতটি কল্পবিধান আছে। বাংলা দেশে ষষ্ঠাদি কল্পানুসারে চারদিন আমাদের দুর্গাপূজা হয়।

রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কথা মহর্ষি বাল্মিকীর রামায়ণে কোথাও উল্লেখ নেই। কালিকাপুরাণ ও দেবীভাগবত অনুসারে রামচন্দ্রের দূর্গাপূজা এখন অনুষ্ঠিত হয়। রামায়ণে দুর্গাপূজা না থাকলেও মহাভারতে (ভীষ্ম পর্ব ২৩/৪/১৬) কৃষ্ণ অর্জুনের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ যুদ্ধজয়ের জন্য দুর্গাস্তব করতে অর্জুনকে বলেন। তাঁর কথায় অর্জুন রথ থেকে নেমে দেবী দুর্গার স্তব করেন। অর্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দুর্গা আকাশ মার্গে অবস্থান করে বলেন, "হে পাণ্ডব! অচিরে তুমি শত্রুগণকে জয় করবে।" (স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রুন্ জ্যেষ্যসি পাণ্ডব।)

মূল রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা না থাকলেও বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে তাঁর রামায়ণে (১৩৪০ শকাব্দ) রামচন্দ্রের অকাল বোধনের কথা যা লিখেছেন, তার কয়েক লাইন "দেবীর নিকটে শ্রীরামের বর লাভ এবং দশমী পূজার অন্তে বিসর্জন" থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

অকাল বোধনে পূজা কৈলে তুমি দশভুজা
বিধিমতে করিলে বিন্যাস ।
লোকে জানাবার জন্য আমারে করিতে ধন্য
অবনীতে করিলে প্রকাশ ।।
রাবণে ছাড়িনু আমি বিনাশ করহ তুমি
এত বলি হৈলা অন্তর্ধান ।
নাচে গায় কপিগণ প্রেমানন্দে নারায়ণ
নবমী করিলা সমাধান ।।
দশমীতে পূজা করি বিসর্জিয়া মহেশ্বরী
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি ।
আদেশ পাইয়া রাম সিদ্ধ কৈল মনস্কাম
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী ।।

দেবীভাগবতে (৩য় স্কন্দ, ২য় অধ্যায়) দেখা যায় যে দেবী দুর্গা প্রথমে কোশলে প্রখ্যাতা ও পূজিতা হন। তারপর ভারতের সর্বত্র সর্ব বর্ণের মধ্যে তাঁর পূজা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু বর্তমানে ঐ সকল দেশে মূর্তি নির্মান করে দুর্গাপূজা হয়না। দুর্গার বিরাট প্রতিমা তৈরি করে বাংলা দেশে দেবীর অর্চনা মহাসমারোহের সঙ্গে কিভাবে প্রবর্তিত হল, সেটা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। রামচন্দ্র বনবাস কালে যে স্থান থেকে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, সেই প্রদেশেও বিজয়োৎসব হয়না। রামচন্দ্রের রাজ্য অযোধ্যা তথা উত্তর প্রদেশেও দুর্গাপূজা হয়না; সেখানে একমাস ধরে বিজয়োৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়াদশমীর দিন দশাননের এক বিরাট মূর্তি তৈরি করে আগুন দিয়ে সেটিকে পোড়ানো হয়।

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুদের পুজা করার কোনো উপায় ছিল না, বরং হাজার হাজার দেবমন্দির মুসলমানেরা ধ্বংস করে। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির বা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বাংলা দেশে রাজা গণেশ ও তারপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুসলমান আমলে সর্বপ্রথম দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন বলে শোনা যায়। কেহ কেহ তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায়কে শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্তক বলেন। প্রবর্তক রাজা গণেশ বা রাজা কংসনারায়ণ যেই হন, বাংলা দেশে পূর্বে মৃন্ময়ী দুর্গাপূজা কখনও হয়নি। যদিও কোন কোন বাড়িতে ঐ পূজা হত, তাও ঘট স্থাপনা করে নমঃ নমঃ করে পূজা হতো। পরে রাজা মহারাজাদের দেখে, তাদের অনুকরণে আমাদের দেশের বড়ো বড়ো ভুম্যধিকারিগণ তাদের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি দেখাবার জন্য শরৎকালে এই দুর্গাপূজার প্রবর্তন বা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে শারদীয়া পূজা বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকে আমাদের দেশে বড়লোকদের বাড়ি প্রথম বিস্তৃতি লাভ করে। তারপর ক্রমশঃ এই পূজা শহর, আধাশহর, গণ্ডগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি ছাড়াও মাঠে ঘাটে হাটে বাজারে হাজার হাজার সার্বজনীন পূজা বর্তমানে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমান ধারায় মূর্তি নির্মান করে দুর্গাপূজা পাঁচশো বছরের বেশী বাংলা দেশে প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব বাঙ্গালীর এই দুর্গোৎসবকে ভারতের শ্রেষ্ঠ পূজা

DO NOT COPY

বলেছেন। তিনি লিখেছেনঃ "It has no superior for magnificence of entertainment and imposing appearance."

দুর্গা নামের তাৎপর্য হচ্ছে যাকে দুঃখে কষ্টে লাভ করা যায়। দূর+গম+ড=দুর্গ। দুর্গ+আপ=দুর্গা। কিন্তু পুরাণে দুর্গা নামক দৈত্যকে বধ করার জন্য দুর্গা নাম হয়েছে বলে লেখা আছে। সুদূর অতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে হিন্দুদের চিন্তারাজ্যে দুটি ধারা বিদ্যমান – বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক ধারার ভিত্তি হচ্ছে বেদ ও উপনিষদ, আর তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি হচ্ছে তন্ত্রগ্রন্থ। বৈদিক ধারার পূর্ণতা গীতায় আর তান্ত্রিক ধারার পরিণতি হচ্ছে সপ্তশতী চণ্ডীতে। বেদের অপর নাম নিগম আর তন্ত্রের অপর নাম আগম। দুটির অর্থ মূলতঃ এক এবং উভয়ই নিখিল জ্ঞান-ভাণ্ডার। ঋষির দৃষ্টিতে উভয়ই অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ ইহা রচনা করেননি। যদিও দেবপূজা শাস্ত্রমতে উপাসনার নিম্নতম স্তর, তথাপি স্তরভেদে দেবপূজা অনস্বীকার্য। কালক্রমে পূজায় যে সব বিধি প্রবর্তিত হয়েছে, সে সব বিধি কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত নয়। মহাভারতে শান্তিপর্বে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, সুরা, মৎস, মধু, মাংস, আসব ও খেচরী প্রভৃতি ধূর্তগণের দ্বারা দেবপূজায় প্রবর্তিত হয়েছে। বেদে ইহা কখনও উপদিষ্ট হয়নি।

দুর্গাপূজা বলতে তত্ত্বতঃ কি বোঝায়? মহামায়া দুর্গা হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির কারণ, রজোগুণের পূর্ণ প্রতীক। আসুরিক শক্তির ধ্বংস শারদীয়া পূজার একমাত্র লক্ষ্য। তমোগুণকে দলিত করে রজোগুণরূপিণী মহামায়ার তাই সিংহবাহনে আবির্ভাব।, মহিষাসুর হচ্ছে তমোগুণের প্রতীক। চণ্ডীতেও এই পূজার কোন কথা নেই। ইহা সম্পূর্ণরূপে পরবর্তীকালে তামসিক পুরাণের পরিকল্পিত কল্পনা। কবি কৃত্তিবাস তামসিক পুরাণের অনুসরণ করে তাই রামচন্দ্রের প্রসঙ্গটি কল্পনা করে তাঁর মহাকাব্যে সন্নিবদ্ধ করে দিয়েছেন। হিন্দীকবি তুলসীদাস কিন্তু তাঁর রামায়ণে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেননি। দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপ কল্পনা ও আরাধনার দিক বিচার করলে একটা সাধারণ জিনিস চোখে পড়ে যে, সেখানে যেমন আছে আত্মমুক্তি ও সমষ্টি কল্যাণের ইঙ্গিত, তেমনই আছে দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। দুর্গার উপাসনাকে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির জন্য কেবল প্রার্থনা হিসাবে না ভেবে, দেবীকে আমাদের অতীত বর্তমানের আধার হিসাবে ভাবতে হবে। দেবী প্রতিমার মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতি ঐশ্বর্য ও গৌরব গাথার ইতিহাস যেমন ঘনীভুত, তেমনই তাঁরই মধ্যে নিহিত আছে আমাদের বাঙ্গালীদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। কেবল দেবী দুর্গার কাছে ধন দাও, যৌবন দাও, রূপ দাও, যশ দাও, সুন্দরী স্ত্রী দাও, শত্রু নিপাত যাক, এই উপাসনা আত্মকেন্দ্রিক; এতে পারমার্থিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের নিম্নোক্ত স্তবই অনন্ত জীবনের পাথেয়-স্বরূপ আমাদের শারদীয়া পূজার একমাত্র মন্ত্র হোক।

দুঃখে দুঃখহারা তারা দুর্গতিনাশিনী ।
দুর্গমে সরণি বিন্ধ্যগিরি নিবাসিনী ।।
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী ।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী ।।
নীলকন্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা ।
সারাৎসারা মূল শক্তি সচ্চিদা সাকারা ।।
মহিষমর্দিনী মহামায়া মহোদরী ।
শিবসীমন্তিনী শ্যামা সর্বাণী শঙ্করী ।।
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী সারদা শাকম্ভরী ।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী ।।
কালী কালহরা কালাকালে কর পার ।
কুল কুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার ।।
লম্বোদরা দিগম্বরা কলুষনাশিনী ।
কৃতান্তদলনী কাল উরোবিলাসিনী ।।

"মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মান ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎপ্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়-ভীত যেন না হই।" **শ্রীঅরবিন্দ** (দুর্গা-স্তোত্র)

DO NOT COPY

অসমবেদনা **সুনন্দন ঘোষ**

আমাদের ছেলের এক বন্ধু কলেজের পড়া শেষ করতে পারেনি।
বালীগঞ্জের বাড়িতে বাড়িতে আঁকা শেখায়।
নিজের বাড়িতে বাপের নেশার খরচ জোগায়!
প্রাচীন সভ্যতা আমাদের!
ত্যাজ্যপুত্র করা যায়, কিন্তু ---- ত্যাজ্য পিতা?
ছেলের ঐ বন্ধু বাড়িতে এলে গল্প করি, খবর নিই,
মনের মধ্যে একটা চিনচিনে বিপন্নতা থাকে –
কিছু দেওয়া কি উচিত ছিল?

বাসন মাজার মেয়েটা আমার গিন্নির কাছে
রোজ সকালে ঠাকুমার ঝুলি খুলে বসে ---
শাশুড়ি তাকে পিটিয়েছে, দেওর পিটিয়েছে ।
বর মহান পুরুষ! পেটায় না।
বৌয়ের টাকা চুরি করে মদ খায়।
তাদের পঞ্চায়েত প্রধান মেরে দিয়েছে আবাস যোজনার টাকা!
না না! পুরোটা মারেনি! এক লাখের থেকে মাত্র পঁচিশ হাজার।
পাশের ঘর থেকে গল্প শুনি।
নারী-স্বাধীনতা নিয়ে আমার মনের মধ্যে মিছিল বেরোয়।
এক সপ্তাহ পরে কাজের মেয়ে গিন্নিকে বলে-
ছেলে মেয়ের জ্বর, কাজে আসবেনা তিনদিন।
ব্যাস্‌স্‌স্‌!
নিমেষে ঐ মেয়ের জন্য জমিয়ে রাখা সহানুভূতির সমুদ্র
বাষ্পবিন্দু হয়ে যায়।

আমাদের ফ্ল্যাটের পাশে ব্যাঙ্কের দরজায়
শুয়ে থাকে ব্যাহত স্মৃতির এক বৃদ্ধ,
সম্পত্তির লড়াইয়ে হেরে যাওয়া মানুষ।
কোভিডের মুখোশ নেই তার।
সারা পাড়া কাঁপছে কোভিড-জ্বরে।
মাসের পর মাস সে নির্বিকার টিঁকে আছে !
বিদ্বজ্জনেরা মুচকি হাসেন; উহানের ভাইরাস
জ্যান্ত মানুষকে ধরে, মরে থাকা প্রাণীদের ছোঁয় না।

করোনা নিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের গবেষণা!
চিকিৎসায় মেগা হাসপাতালের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ দশ লাখ।
দেশে বিদেশে দরদাম চলছে ভ্যাকসিনের ।
এখনও শ্রমিক কৃষকদের ডেটাবেস তৈরি হয়নি।
ঝুপড়িতে ফুটপাথে যারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে,
কোভিডের সংখ্যাতত্ত্বে তাদের নাম ওঠে নি।

স্কুলে ভাব সম্প্রসারণ করতাম -
'শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বোঝেনা।'
লিখেছি পাতার পর পাতা, কিন্তু ---
এখন বুঝি,
ভাবের অভাবটাই সম্প্রসারণ করেছি জীবন জুড়ে।

DO NOT COPY